... শিশুমৃত্যু ... ২
...সমৃদ্ধ ময়দা ... ৪
দাঁত রক্ষা করুন ... ৫
বন্যা পরবর্তীকালে করণীয় ... ৮

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

ICDDR,B CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৫ সংখ্যা ২ শ্রাবণ ১৪০৩

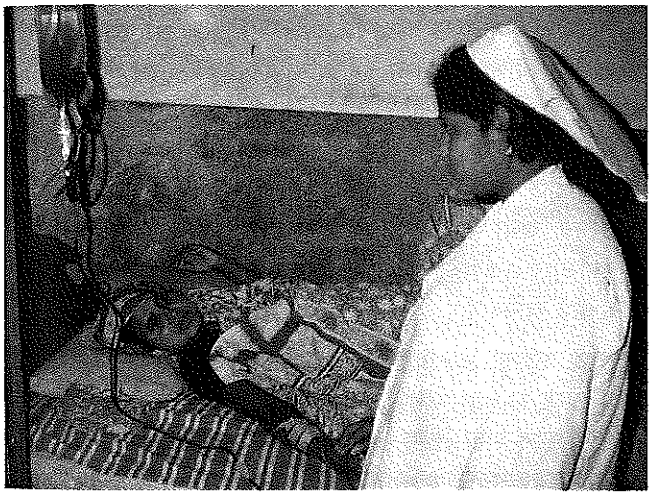

রক্ত পরিসঞ্চালন

ডাঃ মহসীন আহমেদ
ডাঃ মোবারক হোসেন

আমাদের দেশে মাতৃত্বের জটিলতার কারণে মহিলাদের মৃত্যুহার অত্যন্ত বেশি। প্রতিবছর এ-কারণে বাংলাদেশে প্রায় ২৮,০০০ মা মারা যান। সেইসঙ্গে আরো অসংখ্য মা দীর্ঘস্থায়ী জটিলতায় ভুগে থাকেন। বিশ্লেষণে দেখা যায় মায়ের এধরনের মৃত্যুর বিভিন্ন কারণের মধ্যে রক্তপাত অন্যতম। রক্তপাতে মায়েদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মারা যান। সঠিক সময়ে রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে রক্তপাতের কারণে মায়ের এ-মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে।

মায়েদের এই অত্যধিক মৃত্যুহারকে কমানোর লক্ষ্যে সরকার মাঠ পর্যায়ে সেবাদানকারীদের দ্বারা ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর কাছে বার্তা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে যে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় একজন মাকে যথাশীঘ্র নিকটস্থ হাসপাতালে স্থানান্তর করা জরুরী। আমাদের দেশে বেশির ভাগ মানুষের জন্য নিকটস্থ হাসপাতাল মানে থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র। বাংলাদেশে মোট ৩৫২টি থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। এসব স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নানা ধরনের জরুরী রোগীর (যেমন দূর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত, পেপটিক আলসার থেকে রক্তক্ষরণ কিংবা অন্যবিধ রক্তপাতজনিত রোগে আক্রান্ত) পাশাপাশি মাতৃত্বের জটিলতার কারণে রক্তপাতে রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগের ২৫টি থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জরিপ করে ইউনিসেফ দেখতে পেয়েছে যে মাত্র ৬টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রক্ত পরিসঞ্চালনের ব্যবস্থা রয়েছে। এ-ব্যবস্থাও সম্পূর্ণরূপে স্বনির্ভর নয়। জেলা পর্যায় থেকে রক্তের সরবরাহ হয়ে থাকে। জেলা পর্যায় থেকে রক্ত আনার জন্য সময় এবং অর্থ উভয়েরই অপচয় হয়ে থাকে। যাতায়াতে যে সময়টুকু ব্যয় হয় তাতে জরুরী রোগীর অবস্থা গুরুতর হয়ে ওঠে। প্রতি ব্যাগ রক্তের জন্য যাতায়াতসহ কমপক্ষে ৫০০ টাকা ব্যয় হয়ে থাকে। তারপরও রক্তের মান সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। জেলা পর্যায়ে বেশির ভাগ স্থানে পেশাদার লোকদের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। যথাযথ বাছাই করা হয় না বলে রক্তদানকারীর দেহ থেকে রক্তবাহিত রোগসমূহ, যেমন যৌনরোগ, হেপাটাইটিস-বি, এইডস ও আরও অনেক মারাত্মক রোগ রক্তগ্রহণকারীর দেহে সঞ্চারিত হতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রেড ক্রিসেন্ট-এর রক্ত কেন্দ্রের সূত্রে জানা যায় অপেশাদার রক্তদানকারীদের মধ্যে শতকরা ৩ জনের রক্তে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস পাওয়া যায়। পেশাদার রক্তদানকারীদের মধ্যে এর আশংকা অধিকতর হওয়াই স্বাভাবিক।

রক্ত পরিসঞ্চালনের বিষয়টি কারিগরী দিক থেকে থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য কঠিন কিছু নয়। ডাক্তার ও মেডিক্যাল টেক্‌নোলজিস্টদের পক্ষে বিষয়টি সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য। সরকারের উৎসাহে আইসিডিডিআর,বি'র মা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্প্রসারণ প্রকল্প (গ্রামীন) যশোরের অভয়নগর এবং চট্টগ্রামের মীরসরাই থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এমনি একটি পরীক্ষামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে উল্লিখিত দুই থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ২ জন ডাক্তার এবং ২ জন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টকে ঢাকার রেড ক্রিসেন্ট রক্ত কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর একাংশ সংগ্রহ করা

হয় জেলা পর্যায়ের সরকারি ব্যবস্থাপনা থেকে। এর মধ্যে রিফ্রেজারেটর উল্লেখযোগ্য। রক্তের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যেসব পরীক্ষা করা হয়ে থাকে তাতে ব্যবহার্য রাসায়নিক পদার্থ রিফ্রেজারেটরে রাখা আবশ্যক। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে থানা পর্যায়ে ব্লাড-ব্যাংকের কথা আপাতত ভাবা হচ্ছে না বা তার প্রয়োজনও নেই। তাৎক্ষণিকভাবে শুধু মাত্র রক্ত পরিসঞ্চালনের ব্যবস্থা থাকাটাই বর্তমানে যথেষ্ট। অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, বিশেষ করে রক্ত পরীক্ষার রাসায়নিক পদার্থ সরবরাহ করছে আইসিডিডিআর,বি'র উল্লিখিত প্রকল্প। প্রতি থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য এসব সামগ্রীর মূল্য হবে অনুর্ধ্ব দশ হাজার টাকা এবং তা এক-কালীন সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করার পর শুরু করা হয় উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে রক্তদানে উৎসাহীদের তালিকাভুক্তিকরণ। এতে থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পরিবার পরিকল্পনার কর্মীবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণও অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। এ-তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে রক্তদানে উৎসাহী ব্যক্তিদের রক্তের গ্রুপ এবং ঠিকানা সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে তাদের সংগে যোগাযোগ করা হবে। তবে রক্তের প্রয়োজনে রোগীর আত্মীয়-স্বজনকেই রক্তদানে বেশি উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

রক্ত পরিসঞ্চালনের পুরো ব্যাপারটিতে অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি জড়িত। বাজারে রক্তের একটি খালি ব্যাগের মূল্য ৮০-১০০ টাকা। গ্রুপিং ক্রস ম্যাচিংসহ স্ক্রিনিং-এর যাবতীয় রাসায়নিক দ্রব্যের মূল্য ধ'রে স্বেচ্ছায় দানকৃত এক ব্যাগ রক্তের সরবরাহ ব্যয় দাঁড়ায় ২০০ টাকা। এ-কর্মকান্ডকে সফল করার লক্ষ্যে জনগণও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছেন। প্রতিব্যাগ রক্তের বিনিময়ে তারা ২৫০ টাকা দিচ্ছেন। সরবরাহ ব্যয় থেকে আদায়কৃত অর্থ কিছুটা বেশি নির্দ্ধারিত হয়েছে এজন্য যে, যেসব রোগী অর্থ প্রদানে অসমর্থ, তাদের বিনামূল্যে বা আংশিক মূল্যে রক্ত সরবরাহ করার ব্যবস্থা রয়েছে। আদায়কৃত অর্থ দিয়ে পুনরায় রক্তের ব্যাগ এবং অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করা হয়ে থাকে। অভয়নগরে ১৯৯৫ সনের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ১৯৯৬ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত মোট ৪৬ ব্যাগ রক্ত পরিসঞ্চালিত হয়েছে।

স্থানীয়ভাবে রক্ত পরিসঞ্চালনের ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কম সময়ের মধ্যে মানসম্মত রক্ত সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। রোগীর জীবন বাঁচানোর জন্য এ-ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের পূর্বের ন্যায় জেলা পর্যায়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে না এবং অর্থ ব্যয়ও কমেছে। এমনকি এ-ব্যবস্থায় পরিচালনা ব্যয় জনগণের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থে বহন করা সম্ভব হচ্ছে। তবে এ-ব্যবস্থার একটি দুর্বল দিক রয়ে গেছে, তা হলো এইডস রোগের ভাইরাস (HIV) পরীক্ষা এখনও পর্যন্ত সংযুক্ত করা যায় নি। এইডস রোগ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ছড়াচ্ছে। রক্ত প্রদানকারীর রক্তে এ-রোগের ভাইরাস আছে কি না তা নির্দ্ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জন্য এ-পরীক্ষা ব্যয়বহুল। HIV-র প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য প্রতি পরীক্ষার ব্যয় হবে ২০০ টাকা। এর ফলে প্রতিব্যাগ রক্তের মোট খরচ দাঁড়াবে ৪৫০ টাকা। তথাপি এইডস রোগের গুরুত্বের কথা চিন্তা করে এর একটা কার্যকর সমাধান বের করার প্রচেষ্টা চলছে। পাঠক-পাঠিকাদের কাছেও আমরা এ-বিষয়ে পরামর্শ চাইছি।

জলে ডুবে-যাওয়া: শিশুমৃত্যুর একটি কারণ

ডাঃ আনোয়ারুল ইকবাল
ডাঃ আমাতুল উজমা

উচ্চ শিশুমৃত্যুর হার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেরও একটি প্রধান সমস্যা। সংক্রামক ব্যাধি, যেমন ডায়রিয়া, হাম বা লুনতি, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, ইত্যাদি এর প্রধান কারণ। এছাড়াও রয়েছে অপুষ্টি ও অপুষ্টিজনিত রোগ। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় এসব কারণগুলোর প্রতিরোধ ও প্রতিকার এপর্যন্ত প্রাধান্য পাচ্ছে, কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি গ্রামাঞ্চলে এক গবেষণায় দেখা গেছে আরো একটি কারণে উল্লেখযোগ্য হারে শিশুমৃত্যু ঘটছে। আর তা হলো 'জলে ডুবে-যাওয়া'। এক থেকে চার বছরের শিশুরাই প্রধানত এর শিকার হয়। বর্ষা মৌসুমেই এই দূর্ঘটনা বেশি ঘটে।

বাংলাদেশের মত খাল-বিল-নদী নালার দেশে বর্ষা মৌসুমে প্রায় সব নদী-নালাই দু'কূল ছাপিয়ে পার্শ্ববর্তী জায়গাকে প্লাবিত করে। এর ফলে এই মৌসুমে স্থলভাগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পানির নিচে থাকে। বিশেষ করে নিচু এলাকার স্থলভাগের প্রায় বেশির ভাগই পানির নিচে থাকে। এসময় ছোট ছোট খাল, শুকিয়ে-যাওয়া নালা, খাদ ও গর্ত হয়ে ওঠে পানিতে পরিপূর্ণ এবং তৈরি করে ছোট শিশুদের জন্য মৃত্যু-ফাঁদ। অসাবধানতার কারণে বা অন্য কোনোভাবে একবার পানিতে পড়ে গেলে শিশুদের জন্য প্রায়শ মৃত্যু হয়ে ওঠে অনিবার্য।

সম্প্রতি মতলব থানায় আইসিডিডিআর,বি-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ গত দশ বছরে পানিতে ডুবে মারা গেছে ৬৭৩ জন। এর ৭৩ শতাংশই হলো এক থেকে চার বছরের শিশু। বাকি ২২ শতাংশ চার বছরের বেশি বয়সের এবং মাত্র ৫ শতাংশ রয়েছে এক বছরের কম বয়সের শিশু। গবেষণায় আরো দেখা গেছে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৪ সালে বিভিন্ন রোগের কারণে এক থেকে চার বৎসরের শিশুদের মৃত্যু হয়েছে ২,৫৬০ জনের। এর মধ্যে ৪৯০ (১৪%) জনের মৃত্যু হয়েছে 'জলে ডুবে-যাওয়ার' কারণে।

এ ধরনের সেতু পারাপার মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ

যদিও দেখা গেছে সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যুর হার ঐ বয়সের শিশুদের মধ্যে গত ১০ বছরে তুলনা-মূলকভাবে কমে এসেছে (২১ জন/ ১০০০ থেকে ৬ জন/ ১০০০), তথাপি পানিতে-পড়ে মৃত্যুর হার বেড়েছে ১৪ থেকে ১৯ শতাংশ। ফলা-ফলে আরো দেখা গেছে বন্যা-প্রতিরোধ বাঁধের ভিতরের এলাকায় পানিতে-পড়ে এক থেকে চার বছরের শিশুমৃত্যুর হার বাঁধের আওতার বাইরের এলাকার থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

এধরনের পরিবেশে শিশুকে চোখে-চোখে রাখুন

এপর্যন্ত বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর কারণ হিসেবে 'ডুবে যাওয়া'-কে তেমন কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় নি, কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে 'ডুবে যাওয়া' শিশুমৃত্যুর একটি প্রধান কারণ এবং এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া অত্যন্ত জরুরী। সম্ভাব্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা বাঁচাতে পারবে অকালে ঝরে-যাওয়ার আশঙ্কাযুক্ত প্রাণগুলো। এর জন্য প্রয়োজন আরো গবেষণা যা এ-বয়সের শিশুদের 'ডুবে-যাওয়ার' কারণগুলো সনাক্ত করতে সাহায্য করবে। কারণ-ভিত্তিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাই তখন সাহায্য করবে পানিতে-ডুবে শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে। পাশাপাশি 'ডুবে-যাওয়া মানুষের প্রাথমিক পরিচর্যামূলক' ব্যবস্থাও জোরদার করতে হবে।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলো হতে পারে পরিবার থেকে শুরু করে এলাকা-ভিত্তিক। যেমন পরিবারের বড়দের, বিশেষ করে মাকে, সচেতন করতে হবে যে এবং ছোট শিশুকে জলাশয়ের আশে-পাশে একা যাবার ব্যাপারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। রেডিও-টেলিভিশনে সতর্কতামূলক প্রচার বা পোস্টার প্রদর্শনের মাধ্যমে এলাকা-ভিত্তিক প্রচারণা যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি, মসজিদের ইমাম, স্কাউট ও গার্লস গাইডের সদস্যদের এ-ব্যাপারে অংশগ্রহণ যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে।

সরকারি পর্যায়ে নির্মিত বাংলাদেশের নিচু এলাকায় বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রকল্পগুলোও মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

'ডুবে-যাওয়া' শিশুকে উদ্ধার করার সাথে-সাথে কী ধরনের প্রাথমিক পরিচর্যা প্রয়োজন, তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রদানের পদ্ধতি

প্রথমেই শিশুর মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে তাকে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিতে হবে। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দেয়া সম্ভব হলে পানিতে-থাকা-অবস্থায় অর্থাৎ পানির উৎস থেকে তীরে আনার আগেই শুরু করতে হবে।

- প্রথমে শিশুর মুখের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে দেখতে হবে মুখের ভিতর কিছু আটকে আছে কি না। আটকে থাকলে তা বের করে জিভকে সামনে ঠেলে দিতে হবে যাতে জিভ উল্টে না থাকে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধার সৃষ্টি না করে। শিশুর মুখের ভিতর জমে-থাকা শ্লেষ্মাও সেইসাথে পরিষ্কার করতে হবে। মনে রাখতে হবে: পেটের বা ফুসফুসের পানি চেপে বের করার চেয়েও জরুরী হচ্ছে শিশুকে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রদান করা।
- এরপর শিশুকে তাড়াতাড়ি মাটিতে শুইয়ে তার মুখ উপরের দিকে রাখতে হবে। এরপর মাথা সামান্য পিছনের দিকে ঠেলে দিতে হবে যাতে তার চিবুক উপরের দিকে থাকে (ছবি দেখুন)।
- তারপর শিশুর নাক আঙুল দিয়ে চেপে ধরে মুখ হা-করাতে হবে। পরিচর্যাকারীর নিজের মুখ বাচ্চার মুখে রেখে ভিতরে শ্বাস

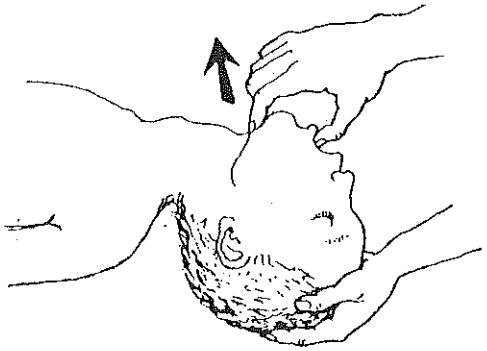

দিতে হবে যাতে বাচ্চার বুক ওঠা-নামা করে। একবার বাতাস দেয়ার পর কিছু সময় দিতে হবে যাতে ভিতরের বাতাস বেরিয়ে যায়। প্রতি তিন সেকেন্ডে একবার এভাবে কৃত্রিম শ্বাস দিতে হবে। যতক্ষণ না সে স্বাভাবিক শ্বাস নেয় বা যতক্ষণ না নিশ্চিত হওয়া যায় যে শিশুটি মারা গেছে এ-পদ্ধতি চালিয়ে যেতে হবে।

- শিশুকে কাত-করে শুইয়ে দিতে হবে যাতে মাথা পায়ের থেকে নিচের দিকে থাকে। তারপর পেট চেপে পানি বার করতে হবে।
- 'ডুবে-যাওয়া শিশুকে' যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

গম থেকে এমাইলেজসমৃদ্ধ ময়দা এবং শক্তিসম্পন্ন পাতলা খাবার তৈরিতে এর ব্যবহার

মুহম্মদ মুজিবর রহমান

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে উন্নয়নশীল দেশে অধিক বয়সের শিশুদের একটি বিরাট অংশ আমিষজাতীয় পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। কম শক্তিসম্পন্ন খাদ্য গ্রহণ এসব শিশুদের পুষ্টিহীনতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বাংলাদেশে মায়ের দুধের প্রথম পরিপূরক খাদ্য হিসেবে সাধারণত চাল, গম, মিষ্টি-আলু ও আলুজাতীয় শর্করা থেকে তৈরি আঠালো (বেশি ঘন) খাবার ব্যবহার করা হয়---রান্না করার সময় যা ফুলে-ফেঁপে খুব আঠালো (হালুয়ার মত) হয় এবং তা প্রায়ই শিশুদের খাওয়ার উপযোগী হয় না, বিশেষ করে শিশু যখন অসুস্থ অবস্থায় পাতলা খাবার খেতে চায়। এই আঠালো খাবার শিশুর খাওয়ার উপযোগী করার জন্য পানি মিশিয়ে পাতলা করা হয়, তখন খাদ্যে শক্তির পরিমাণ কমে যায়, স্বাদও ঠিক থাকে না। কাজেই পারিবারিক পর্যায়ে সাধারণত কম-খরচে ঐতিহ্যবাহী খাবারের (খিচুড়ি, হালুয়া, সুজি, পরিজ, ইত্যাদি) ঘনত্ব কমানোর পদ্ধতি জানা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য সংলাপে শিশুদের জন্য বাড়তি বা পরিপূরক খাবার সম্পর্কে একাধিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বেশির ভাগ খাবার (খিচুড়ি, হালুয়া, সুজি) ঘন এবং আঠালো হওয়ায় শিশুদের বিশেষ করে রুগ্ন শিশুদের পক্ষে ঠিক গিলে বা চুমুক দিয়ে খাওয়ার উপযোগী নয়। এ-অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য গবেষকগণ উদ্ভাবন করেছেন এমাইলেজসমৃদ্ধ ময়দা যা মিশিয়ে ঘন এবং আঠালো খাবারকে পাতলা করা যায় এবং তা শিশুরা অতি সহজেই গ্লাসে, কাপে বা বাটিতে নিয়ে চুমুক দিয়ে গিলে খেতে পারে।

আলফা-এমাইলেজ এনজাইম নামক দ্রব্য জটিল শর্করাজাতীয় খাবারকে ভেঙ্গে ছোট এবং সরল শর্করায় (ডেক্সটাইন, গ্লুকোজ, মালটোজ) পরিণত ক'রে খাবারকে পাতলা করে দেয়। তাই গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ ভাঙ্গার ফলে ঘন খাদ্য পানি না-মিশিয়েও পাতলা করা যায় এবং সাধারণ অণু হওয়াতে তা সহজে শরীরে গৃহীত হয়। সুতরাং পরিমাণ এবং আনুপাতিক শক্তি ঠিক রেখে অঙ্কুরিত শস্য ব্যবহারের মাধ্যমে ঘন খাবারকে (খিচুড়ি, হালুয়া ইত্যাদি) পাতলা করা যায়---যা শিশুরা সহজেই গিলে খেতে পারে।

এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে গম, সরগম, ভুট্টা, কাউন বা বাজরাজাতীয় শস্যদানা অঙ্কুরিত করে এমাইলেজ নামক বিশেষ এনজাইমটি প্রস্তুত করা যায়---যা শক্ত অথবা আধা-শক্ত খাবারে সামান্য পরিমাণে (প্রতি ১০০ গ্রামে ২ গ্রাম) এমাইলেজ পাউডার মিশিয়ে আয়তন বৃদ্ধি ছাড়াই তরল বা পাতলা করা যায়। এতে পুষ্টির সামান্যতম ক্ষতিও হবে না বরং স্বাদে ও গন্ধে সমৃদ্ধ হবে। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে গম থেকেই উৎকৃষ্ট এবং সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন এমাইলেজ পাওয়া যায়। আইসিডিডিআর,বি-র একজন সহযোগী বিজ্ঞানী জনাব এমএ ওয়াহেদ ও অন্যান্যরা এমাইলেজসমৃদ্ধ খাবার

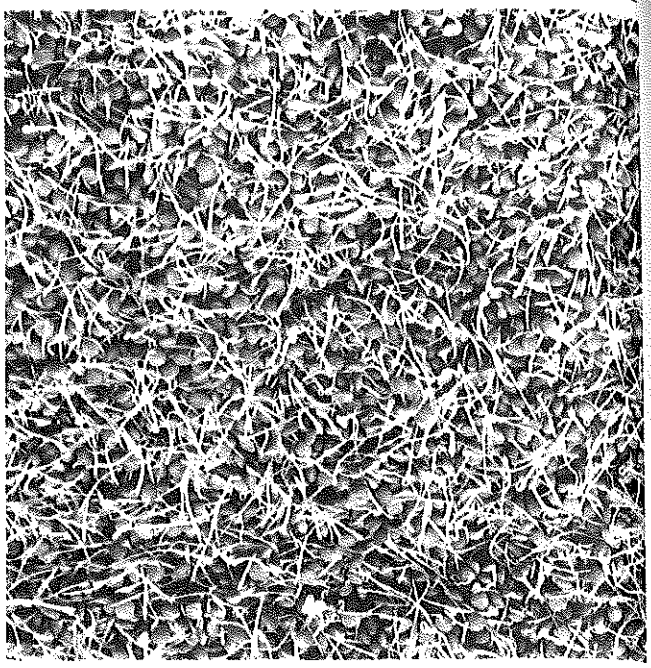

প্রস্তুতের একটি সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছেন যার বিবরণ নিচে দেয়া হলো:

প্রস্তুত প্রণালী

গম প্রথমে পরিষ্কার পানিতে খুব ভাল করে (৩-৪ বার) ধুয়ে নিতে হবে এবং ৮-১২ ঘন্টা সাধারণ তাপমাত্রায় (২৮° সেন্টিগ্রেড) পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর পানি থেকে ভেজা গম উঠিয়ে কালো রং-এর ভেজা কাপড় বিছানো ট্রে-তে ছড়িয়ে আর একটি পাতলা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে অন্ধকার স্থানে রাখতে হবে। মাঝে-মাঝে অল্প পানি ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে গম শুকিয়ে না যায়। ৪৮ ঘন্টা পর দেখা যাবে গমগুলোতে খুব সুন্দর অঙ্কুর গজিয়েছে। তবে অঙ্কুর ও শেকড় -এর পার্থক্য বুঝতে হবে। অঙ্কুর উপরের দিকে ওঠে যা পরে শাখা-প্রশাখা হয় আর শেকড় নিচের দিকে যায় অর্থাৎ মাটির নিচে মূল হিসাবে বাড়ে। এমাইলেজের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে অঙ্কুর--- শেকড় নয়। এবার গম অপর একটি শুকনো ট্রে বা পাত্রে ছড়িয়ে দিয়ে ১২ ঘন্টা পর্যন্ত চলন্ত বৈদ্যুতিক পাখার নিচে রাখতে হবে---যাতে আলগা পানি শুকিয়ে যায়। এরপর গমগুলো ৫০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাযুক্ত ওভেনে ১২ ঘন্টা পর্যন্ত রাখতে হবে--যাতে অঙ্কুরিত গম ভালভাবে শুকিয়ে গুঁড়া করার উপযোগী হয় এবং এমাইলেজের কার্যকারিতা বেশি দিন থাকে। যদি ওভেন না থাকে (গ্রামাঞ্চলে) তবে অল্প আঁচে হাঁড়িতে বা কড়াইয়ে ভেজে নেয়া যেতে পারে। তবে এই ভাজার ফলে এমাইলেজের কার্যকারিতা বেশি দিন থাকবে না, কারণ ভাজার সময় তাপমাত্রা প্রায় ১০০° সেন্টিগ্রেড-এর মত হয়ে যায়---যা যেকোনো ধরনের এনজাইমের জন্য ক্ষতিকর। এরপর শুকনো গম মেশিনে অথবা ঢেঁকিতে অথবা শুকনো পাটায় বেটে গুঁড়া (ছাতু) করে ছাকনীতে ছেকে নিতে হবে। এই অঙ্কুরিত গমের গুঁড়া (ছাতু/ময়দা)-ই হচ্ছে এমাইলেজ এনজাইমসমৃদ্ধ ময়দা---যা শিশুদের বাড়তি খাবারে ব্যবহার করা যায়।

(৭ এর পাতায় দেখুন)

কিছু নিয়ম মেনে চলুন : দাঁত রক্ষা করুন

মোড়ল নজরুল ইসলাম

দাঁত মানুষের একটি অমূল্য সম্পদ, কিন্তু বাংলাদেশে ১২ কোটি লোকের দাঁতের চিকিৎসা–চিত্র বড়ই করুণ। মাত্র দু'একজন ছাড়া কেউ দাঁতের রোগের চিকিৎসা করান না। দেশের অন্তত ৯০/৯৫ ভাগ লোক হাতুড়ে দন্ত–চিকিৎসক তথা প্রতারকের খপ্পরে পড়ে অকালে দাঁত হারান। গ্রামের অসচেতন অজ্ঞ সাধারণ মানুষ দাঁতের জন্য গুল, তামাক ইত্যাদি নেশাজাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করেন, এতে দাঁতের মাড়ির গোড়া–ক্ষয়জনিত সমস্যা দেখা দেয় এবং দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৮৯ সালের হেলথ সার্ভিস রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে মাত্র ৫৯২ জন রেজিস্টার্ড ডেন্টাল সার্জন রয়েছেন। ১২ কোটি লোকের অনুপাতে এ–সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। উল্লেখ্য, দাঁতের বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। এসব রোগের প্রাথমিক লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্মন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বিশিষ্ট দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরূপ রতন চৌধুরী দন্ত–ক্ষয় ও মাড়ির রোগ সম্পর্কে বলেন, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি হাসপাতালে ডায়াবেটিক রোগীদের মধ্যে এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২,৯৯৫ জন রোগীর মধ্যে শতকরা ৭৮ দশমিক ৭২ ভাগ মাড়ির রোগ ও শতকরা ২১ দশমিক ২৮ ভাগ দন্ত–ক্ষয় (ডেন্টাল ক্যারিজ) রোগে আক্রান্ত। উক্ত বিশেষজ্ঞের মতে এ'দুটি রোগের জন্য ডেন্টাল প্লাক দায়ী। ডেন্টাল প্লাক হচ্ছে লক্ষ–লক্ষ জীবাণুর সমষ্টি। মুখে এধরনের জীবাণু সবসময় অবস্থান করে। খাদ্যবস্তুর আবরণকে ব্যাকটেরিয়াল প্লাক বলে। এর প্রতি মিলিগ্রামে ৪০ কোটি জীবাণু থাকে।

ডেন্টাল ক্যারিজ ঃ প্লাক থেকে নিঃসৃত অম্ল (এসিড) দাঁতের এনামেলকে ক্ষয় করার পর নিচের দিকে গর্ত সৃষ্টি হয়। এই ক্ষয়–পদ্ধতিকে ডেন্টাল ক্যারিজ বলে। এ–রোগ যদি দন্তমজ্জা পর্যন্ত না পৌঁছায় তবে একটি সাধারণ ফিলিংজাতীয় চিকিৎসার মাধ্যমে দাঁত রক্ষা করা যায়, কিন্তু দন্ত–মজ্জায় প্রদাহ সৃষ্টি হলে সাধারণ ফিলিং–এ উপশম হবে না। সেক্ষেত্রে দাঁতের মুল নালী ও দন্ত–প্রকোষ্ঠ জীবাণুমুক্ত করে ফিলিং করতে হবে। এতেও উন্নতি না হলে ছোট্ট অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়ে।

মাড়ির রোগ

মাড়ির রোগ সৃষ্টির জন্য প্লাক অনেকাংশে দায়ী। এই প্লাকের ফলে মাড়ির প্রদাহ সৃষ্টি ও দাঁত–মাড়ির স্বাভাবিক সংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে পরবর্তীকালে একধরনের গর্ত সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এ–প্রদাহের ফলে মাড়ি ফুলে যায় এবং সামান্য আঘাতেই রক্ত বের হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এ–প্রদাহ বেড়ে যায় ও গর্তের গভীরতা বেড়ে খাদ্য, জীবাণু ও পুঁজ জমা হতে থাকে। ফলে মুখে তীব্র দুর্গন্ধ হয়। প্রিয়জনও অনেক সময় মুখের কাছে মুখ নিতে চায় না। এ–চরম অবস্থায় দাঁত ধীরে–ধীরে মাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মাড়ির এ–রোগকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। মাড়িতে প্রদাহ সৃষ্টি হলে জিনজিভাইটিস এবং যখন গর্ত সৃষ্টি করে তখন বলা হয় পেরিওডেন্টাইটিস।

চিকিৎসা

- দাঁতে প্লাক সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করা এবং দাঁত ও মাড়ির পারিপার্শ্বিক প্লাকগুলোকে পরিস্কার করে ফেলা অর্থাৎ স্কেলিং করানো।
- স্কেলিং–করানো ও মাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন–হওয়া দাঁতকে শৈল্য–চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করা।

দন্ত–বিশেষজ্ঞের মতে কিছু নিয়ম–কানুন মেনে চললে ডেন্টাল ক্যারিজ ও প্যারিডেন্টাল রোগ সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। নিয়মগুলি হচ্ছে:

- সকালে ও রাতে দু'বেলা দাঁত ব্রাশ করা। টুথপেস্টের সঙ্গে নিমের ডাল ব্রাশের মত করে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- খাদ্য গ্রহণের পর তাড়াতাড়ি দাঁত ও মাড়ি পরিস্কার করা। বাচ্চাদের চকলেট, টফি, লজেঞ্জ, চুইংগাম খাওয়া থেকে বিরত রাখা।
- নির্দিষ্ট সময়ে খাবার খাওয়ার অভ্যাস করা এবং মধ্যবর্তী সময়ে শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ না করা।
- ফ্লুরাইডযুক্ত টুথপেস্ট ব্যবহার করা।
- দাঁতের অবস্থান পরীক্ষা করা এবং টেরা–বাঁকা দাঁতের চিকিৎসা করা।
- দেহের অন্যান্য রোগের সঠিক চিকিৎসা করা।
- প্রতিদিন পরিমাণমত সবুজ শাক–সবজি ও শক্ত ফলমুল খাওয়া।
- শিশুদের বোতলে দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস না করে মায়ের বুকের দুধ এবং পরে কাপ/গ্লাসে দুধ খাওয়ানো।
- ধুমপান, পান, জর্দা, তামাক–পাতা, গুল, ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করা।
- প্রতিবছর একজন মুখ ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে দাঁত ও মাড়ি পরীক্ষা করানো।

দন্ত বিশেষজ্ঞদের মতে উল্লিখিত সাধারণ নিয়মগুলো মেনে চলতে পারলে দীর্ঘদিন দাঁত সুস্থ থাকে ও দাঁতের আয়ু দীর্ঘ হয়।

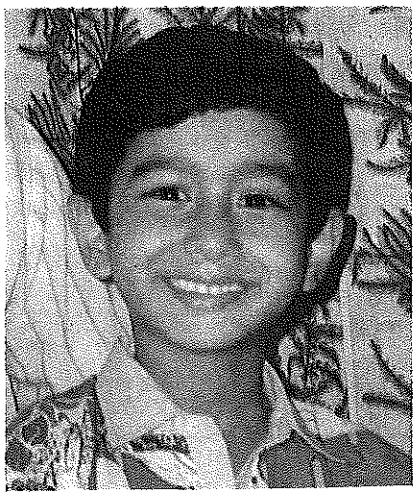

অন্ত্রই জীবাণুর চারণভূমি

গাজী মোহাম্মদ আলী

যুগ-যুগ ধরে মানুষ তার অক্লান্ত সাধনাবলে জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়ে চলেছে অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার পরম বাসনা নিয়ে। জীব-জগতে সুক্ষ্ম জীবকুলের জীবন-পদ্ধতি সম্যকভাবে উপলব্ধির জন্য একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

আমরা খালি চোখে সাধারণত একশত মাইক্রন আকারের বস্তু দেখতে পারি। (১ মাইক্রোন=০.০০১ মিলিমিটার অথবা ১ ইঞ্চির ২৫০০০ ভাগের এক ভাগ)। 'লিয়ন হুকে'র অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে বিজ্ঞানীদের যে-যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে এমন একটা পর্যায়ে এসেছে যে ০.২ মাইক্রোন ব্যাসের জীবাণু পর্যন্ত সহজে অবলোকন করা যায়। জীবাণুকে জানার কৌশল আবিস্কারের ফলে জীবাণুকুলের জীবন-পদ্ধতি মানুষের জানার সীমার মধ্যে এসেছে।

জীবাণু নিয়ে বিজ্ঞানীরা যতই নব-নব তথ্য আবিস্কার করছেন, মানুষের কৌতুহল ততই বাড়ছে — আবিস্কারের দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। লক্ষ কোটি অদেখা জীবনের বিচিত্র রূপ ও চলার ভঙ্গি, আর বিচিত্র কার্যপ্রণালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়। মানুষ জীবাণুকুলকে যতই জানছে, ততই বেশি কৌতুহলী হয়ে উঠছে ও জানার বিভিন্ন কৌশল আবিষ্কার করছে।

এ-যন্ত্রের উচ্চতম প্রযুক্তির ইলেক্ট্রনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র এখন মানুষ ব্যবহার করছে। আজ তা দিয়ে ০.৫ মিলিমাইক্রন পর্যন্ত দেখা সম্ভব। পানিতে ছোট-ছোট যে-জীবাণুগুলো খালি চোখে দেখা যায় না সেগুলো এ-যন্ত্রের মাধ্যমে বড়-বড় চিংড়িমাছের মত দেখা যায়। এ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখা সম্ভব হচ্ছে রোগ সংক্রমণকারী 'ভাইরাস'-এর মত ক্ষুদ্র জিনিসকেও।

জীবাণু যখন দেখা গেল, তখন তাদের চরিত্র ও জীবন-পদ্ধতি জানার তাগিদও মানুষ অনুভব করলো। জীবাণুর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যই তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখে, বংশ বৃদ্ধি ঘটিয়ে শুরু হলো নতুন নতুন গবেষণা। আর এ-গবেষণার ফলশ্রুতি হিসেবে এসেছে কৃত্রিম উপায়ে জীবাণু প্রজননের অভিনব পদ্ধতি। জীবাণুকে উপযুক্ত খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে ও বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে জীবাণুর জীবন-পদ্ধতি জানা অধিকতর সহজ হলো। জানা গেল: বিভিন্ন ধরনের খাদ্য, তাপমাত্রা, জল, বায়ু, ক্ষারত্ব-অম্লত্বের অনুপাত, ইত্যাদি এদেরও বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। উপযুক্ত খাদ্য ও পরিবেশে দেখা গেল জীবাণু গোষ্ঠিবদ্ধভাবে অবস্থান করে। জীবাণুর এ-গোষ্ঠিবদ্ধ অবস্থানকে "কলোনি" বলা হয়। একটা সরিষার পরিমাণ কলোনিতে লক্ষ-লক্ষ জীবাণু অবস্থান করে।

বিভিন্ন রোগ-জীবাণু সনাক্তকরণ

জীবাণুর গঠন, চলন ও কার্যভেদে এদের পৃথক করা যায় বা সঠিকভাবে চেনা যায়। বিশেষ রং ব্যবহার করে জীবাণুর বহিঃআকৃতি দেখা, কলোনির বহিঃআকৃতি দেখা, চলার গতি পরীক্ষা, জৈব-রাসায়নিক পরীক্ষা, সেরোলজি দেখা, ইত্যাদির মাধ্যমে জীবাণুগুলোকে সনাক্ত করা যায়।

আবহাওয়া ও জলবায়ু অর্থাৎ পরিবেশভেদে পৃথিবীর লোক-বসতির ঘনত্বের তারতম্য আছে। মানবদেহ ঘিরে জীবাণুর যে অবস্থান তাও তেমনি পরিবেশ-নির্ভর। বহু গবেষণা-লব্ধ তথ্য থেকে জানা গেছে মানবদেহের অন্ত্রই হচ্ছে জীবাণুর ঘন-বসতি পূর্ণ এলাকা।

অন্ত্রনালী মানবদেহের এমন একটি অঞ্চল যে-পথ দিয়ে মানুষের পানীয়, খাদ্য ও তার সারাংশ/অসারাংশ আত্মীকরণ ও নির্গমণ হয়ে থাকে। অন্ত্রের তাপমাত্রা বা পরিবেশ জীবাণুর অবস্থান ও বংশবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে: বহু শ্রেণীর জীবাণু অন্ত্র-দেশে বসবাস করে। চরিত্রে এরা কেউ মানুষের শত্রু, কেউবা মিত্র হলেও পরস্পর মিলেমিশে সহ-অবস্থান করে আছে। এদের পারস্পরিক আচরণ কেমন তা এখনো গবেষণাসাপেক্ষ। তাদের সহ-অবস্থান শান্তিপূর্ণ কি না তা অবশ্য এখনো জানা যায় নি।

প্রোটোজোয়া এবং ছত্রাক শ্রেণীকে বাদ দিলেও কেবলমাত্র এক গ্রাম পরিমাণ (মটর দানার পরিমাণ) মলে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা দাড়ায় $১০^{১০}$ অর্থাৎ ১০০০০০০০০০ (এক শত কোটি)। অবস্থান ও পরিমাণের ওপরই নির্ভর করে কী সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক। কোনো কোনো সময় রোগ সংক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো মানবদেহে কোনো প্রকার রোগ সৃষ্টি না করেই অবস্থান করে থাকে। এসব ব্যাকটেরিয়া অন্য সুস্থ মানবদেহের সংস্পর্শে এসে উপযুক্ত স্থানে অবস্থান করে—আবার রোগও সৃষ্টি করে থাকে। যেসব মানুষ নিজেরা রোগে আক্রান্ত হয় না অথচ রোগ-জীবাণু বহন করে, তারা রোগ-বাহক বা রোগ-জীবাণু বাহক। অন্যান্য জীবও রোগ-বাহক হতে পারে, যেমন কুকুর, বিড়াল, অন্যান্য পশু, পাখি ইত্যাদি। ব্যাকটেরিয়া মানবদেহের শুধু শত্রুই নয়, বন্ধুও বটে। কতগুলো ব্যাকটেরিয়া আছে যা মানবদেহে ভিটামিন, পাচক রস, ইত্যাদি তৈরি করে থাকে, যা মানবদেহের জন্য উপকারী।

মলত্যাগের ব্যাপারে আমাদের সবাইকে হতে হবে সাবধান। এজন্য খোলা-পায়খানা ব্যবহার না করে স্যানিটারী পায়খানা ব্যবহার করা উচিত। এতে জীবাণু, মশা-মাছি ও পানির মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে না।

এক গ্রাম বা মটরদানা পরিমাণ মলে যদি লক্ষ কোটি জীবাণু অবস্থান করে থাকে, তাহলে মানবদেহের ভিতরে মল ও অন্ত্রে কী পরিমাণ জীবাণু অবস্থান করছে তা ভাবতে গেলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। তাই মলত্যাগের ব্যাপারে আমাদের সবাইকে হতে হবে সাবধান। এজন্য খোলা-পায়খানা ব্যবহার না করে স্যানিটারী পায়খানা ব্যবহার করা উচিত। এতে জীবাণু, মশা-মাছি ও পানির মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে না। আরো একটা ব্যাপারে সাবধান হতে হবে—তা হলো মলত্যাগের পর ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করে হাত সাবান, ছাই অথবা মাটিতে ভালভাবে ঘষে নিয়ে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। নয়তো হাতের রেখার মধ্যেও লক্ষ-লক্ষ জীবাণু আপনার অজান্তে অবস্থান করবে এবং খাদ্য ও পানির মাধ্যমে পেটে গিয়ে নতুন করে ডায়রিয়া, আমাশয়, কৃমিজনিত রোগ ইত্যাদি সৃষ্টি করবে।

কাজেই অন্ত্রই যে জীবাণুর চারণভূমি বা ঘাঁটি কথাটা এখন আরো পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল। তাই আমাদের স্মরণে রাখতে হবে: 'অন্ত্র যথার্থই জীবাণুর চারণভূমি' — তা উপকারী বা অপকারী যে প্রকৃতিরই হোক না কেন।

স্বাস্থ্য কুইজ--১৭

১. এ-বছর ১৬ এপ্রিল ও ১৬ মে জাতীয় টিকা দিবস অনুষ্ঠিত হলো। এ-দিবসের উদ্দেশ্য কী? বিশ্বের কয়টি দেশে এ-উদ্দেশ্য সফল হয়েছে?

২. বিশ্বব্যাপী মরণব্যাধি এইডস্-এর প্রতিরোধে জাতিসংঘের উদ্যোগে ইউএনএইডস কর্মসূচী শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে এই কর্মসূচীর কো-অর্ডিনেটর কে এবং কয়টি সংস্থা এর সদস্য?

৩. বাংলাদেশে ৩০ জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত কতজন HIV-পজিটিভ সনাক্ত হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

৪. প্রসবোত্তর পরিদর্শনের সময় প্রসূতি মায়ের দেয়া কী কী প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হলে তাঁকে নিকটস্থ প্যারামেডিকের নিকট বা হাসপাতালে পাঠাতে হবে?

৫. কত মাস বয়স থেকে শিশুকে অন্যান্য খাবার, যেমন ডিম, কলা, খিচুড়ি খেতে দেয়া উচিত?

[উত্তর আমাদের কাছে ১৫ অক্টোবর ১৯৯৬-এর আগেই পৌঁছাতে হবে।]

স্বাস্থ্য কুইজ-১৬ এর উত্তর

১. প্রসবের পর মাকে যেসব বিষয়ে উপদেশ এবং শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন সেগুলো হলো :

* শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো এবং স্তনের যত্ন নেয়া।
* শিশুর স্বাস্থ্যের যত্ন, বিশেষ করে শিশুর নাভির যত্ন যতদিন পর্যন্ত নাভি না শুকায়।
* মায়ের জন্য উপযুক্ত পুষ্টিকর খাবার দেয়া।
* ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা।
* পরিবার পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
* সাংসারিক কাজকর্ম ও বিশ্রাম।
* শিশুর টিকা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা।
* পুনরায় স্বামী-সহবাস শুরু করা।

২. মায়ের টিবি বা যক্ষ্মা রোগ থাকলেও শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো যায়। তবে মাকে টিবি'র ঔষধ খাওয়ানোর পাশাপাশি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে শিশুকে যক্ষ্মা বা টিবি'র চিকিৎসা দিতে হবে।

৩. নিউমোনিয়া-আক্রান্ত শিশুর মধ্যে নিচে উল্লিখিত লক্ষণগুলো দেখা যায় :

* শ্বাস-প্রশ্বাস খুব দ্রুত হয়।
* শ্বাস নেয়ার সময় বুক মারাত্মকভাবে ভিতরের দিকে চেপে যায়।
* শ্বাস-প্রশ্বাসে ফোঁস-ফোঁস শব্দ হয়।
* জ্বর বা স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে শরীরের তাপমাত্রা কম থাকে।
* খাবারে অরুচি দেখা দেয়।

৪. বাড়িতে স্বাভাবিক প্রসব নিরাপদ করার জন্য একজন গর্ভবতী মাকে যেসব বিষয়ে উপদেশ দিতে হবে সেগুলো হচ্ছে :

* প্রসবের জন্য পরিস্কার স্থান ঠিক করা।
* নতুন ব্লেড ও সূতা যোগাড় করে রাখা।
* প্রসবে সহায়তাকারীর নখ কাটা এবং হাত পরিস্কারভাবে সাবান দিয়ে ধোয়া।
* প্রসবের সময় এলাকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সহায়তা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেয়া।
* মা ও নবজাত শিশুর জন্য সিদ্ধ করা রৌদ্রে শুকানো পরিস্কার কাপড়ের ব্যবস্থা করা।

৫. আমাদের দেশে এমনিতেই বেশির ভাগ মহিলা রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন। গর্ভবতী অবস্থায় আয়রনের চাহিদা আরো বেড়ে যায়। আবার একজন গর্ভবতী মায়ের সন্তান প্রসবের সময় শরীর থেকে যথেষ্ট পরিমাণ রক্তপাত হয়। যদি মায়ের রক্তে আয়রনের পরিমাণ কম থাকে তবে রক্তক্ষরণ বেশি হয়ে মায়ের মৃত্যু হতে পারে। সেজন্য গর্ভবতী মায়ের খাবারে যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন উপাদান থাকতে হবে।

(স্বাস্থ্য কুইজ-১৬ এর সবকটি সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেন নি)

এমাইলেজসমৃদ্ধ ময়দা

(চার-এর পাতার পর)

সহজ ছকের সাহায্যে এআরএফ-এর প্রস্তুত প্রণালী নিচে দেখানো হলো :

গম দানা
↓
গমদানাগুলো ভাল করে ধুয়ে নিন
↓
১২ ঘন্টা পর্যন্ত পরিষ্কার পানিতে ভিজিয়ে রাখুন
↓
অঙ্কুরিত হওয়ার জন্য ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে দিন
↓
বৈদ্যুতিক পাখার নিচে সাধারণ তাপমাত্রায় ১২ ঘন্টা পর্যন্ত রাখুন
↓
৫০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ওভেনে ১২ ঘন্টা পর্যন্ত রাখুন
(ওভেনের অভাবে অল্প আঁচে কড়াই অথবা মাটির হাঁড়িতে ভেজে নিতে পারেন)
↓
গুঁড়া করে ছেকে নিন। এভাবে এআরএফ ময়দা খুব সহজে প্রস্তুত করতে পারেন।

কিভাবে এআরএফ খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার করবেন

প্রথমে চাল-ডালের খিচুড়ি অথবা চাল বা গমের গুঁড়া বা ছাতু দিয়ে হালুয়া বা সুজি রান্না করে নিন। এরপর অল্প গরম-থাকা-অবস্থায় কাপ বা বাটিতে ঢেলে নিয়ে এতে অল্প (এক বা দুই চিমটি) এআরএফ-এর গুঁড়া মিশিয়ে ভাল করে চামচ দিয়ে নেড়ে ৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। দেখা যাবে হালুয়া বা সুজি সম্পূর্ণভাবে ঘোলের মত হয়ে গিয়েছে---যা যেকোনো বয়সের শিশুরা চুমুক দিয়ে গিলে খেতে পারবে। দেখা যাবে এই নরম এবং তরল খাবার স্বাদে এবং গন্ধে আরো উন্নত মানের হয়েছে।

জেনে রাখা ভালো

বন্যা পরবর্তীকালে কি করবেন

স্বাস্থ্য সংলাপের এ-সংখ্যা যখন পাঠকের কাছে পৌঁছুবে তখন দেশের দু'শ থানার প্রায় দেড় কোটি লোক বন্যা-কবলিত হয়েছেন। কিছুসংখ্যক প্রাণহানিও ঘটেছে।

ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়েছে বন্যা-উপদ্রুত বিস্তীর্ণ এলাকায়, এসব রোগের মধ্যে রয়েছে আমাশা, রক্ত আমাশা, ভাইরাল হেপাটাইটিস, চর্মরোগ ইত্যাদি।

বন্যা পরবর্তীকালে মহামারীর প্রাদুর্ভাব সমতলীয় বাংলাদেশে চিরাচরিত ঘটনা। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবই এর মূল কারণ। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নলকূপই বিশুদ্ধ পানির একমাত্র উৎস। বন্যার পানিতে বহু নলকূপও তলিয়ে যায় এবং পানিবন্দী মানুষের জন্য দূষিত পানি পান করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

বন্যা পরবর্তীকালে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমরা সহজেই মহামারী রোধ করতে বা তার তীব্রতা কমিয়ে আনতে পারি।

আপনার করণীয়:

- পানি সরে যাবার সাথেসাথে বাড়ির আশেপাশের ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করে ফেলুন।
- পানি ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে বানে ভেসে-আসা মরা-পচা জীবজন্তু, পশুপাখি মাটির নিচে পুঁতে ফেলুন।
- অবশ্যই নলকূপের পানি পান করুন। রান্না ও থালাবাসন ধোয়ার কাজেও একই পানি ব্যবহার করুন।
- নলকূপের পানি পাওয়া একান্তই অসম্ভব হলে এক কলসী পানিতে এক চা-চামচ ফিটকিরি মিশিয়ে এক ঘন্টা অপেক্ষা করে ব্যবহার করুন।
- জলাবদ্ধ পায়খানায় মলত্যাগ করুন। বিকল্প হিসেবে, নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করে মলত্যাগ করুন। প্রতিবার ব্যবহারের পর ছাই বা মাটি দিয়ে মল ঢেকে দিন।
- বন্যা-দুর্গত এলাকায় কর্মরত সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকর্মী, মেডিকেল টীম, অভিজ্ঞ জনগণ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করুন ও তাঁদের পরামর্শ নিন।
- ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুসহ সকল রোগীকে খাবার স্যালাইন খেতে দিন। কয়েক প্যাকেট খাবার স্যালাইন ঘরে রাখুন সবসময়। ঘরে খাবার স্যালাইন তৈরির পদ্ধতি স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে জেনে নিন।
- সাপে-কাটা রোগীকে ওঝা বা কবিরাজের কাছে নেবেন না। সাপে কাটা মাত্র ক্ষতস্থানের চার আঙ্গুল উপরে দড়ি, শাড়ির পাড় বা পায়জামার ফিতা দিয়ে কষে একাধিক বাঁধ দিন। দংশিত ব্যক্তিকে ঘুমাতে দেবেন না। দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তর করুন।
- পানিতে ডুবে-যাওয়া শিশু বা ব্যক্তিকে দ্রুত উদ্ধার করুন। পেটে চাপ দিয়ে পানি বের করে ফেলুন। কৃত্রিম বিষয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চালনের চেষ্টা করুন। এ ব্যাপারে দক্ষ ব্যক্তির সাহায্য নিন। তার কাছে আগেভাগেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।

ঘরে-তৈরি স্যালাইন

আপনি নিজে গুড় অথবা চালের গুঁড়া দিয়ে বাড়িতে স্যালাইন তৈরি করে একবার পাতলা পায়খানা হবার সাথে-সাথেই রোগীকে খাওয়াবেন।

লবণ-গুড়ের স্যালাইন

আধা লিটার খাবার পানির সাথে তিন আঙ্গুলের প্রথম দাগের সমান এক চিমটি লবণ ও এক মুঠ যেকোনো ধরনের গুড় ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। স্যালাইন বানানোর সময় লবণ, গুড় ও পানির পরিমাণ অবশ্যই ঠিক রাখতে হবে। গুড় না পেলে এক মুঠ চিনি ব্যবহার করা যাবে।

চালের গুঁড়ার স্যালাইন

এক মুঠ চাল (আতপ বা সিদ্ধ) ১০/১৫ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে তারপর পিষে নিন। (মশলা পেষার শিল-নোড়া পরিস্কার করে ধুয়ে নেবেন)। এবার চালের গুঁড়াকে আধা লিটার পানিতে ভাল করে গুলিয়ে নিন। এখন আরো আধা কাপ পানি মেশান। জ্বাল দেওয়ার সময় পানি বাষ্প হয়ে কমে যায় বলে এই বাড়তি পানি মেশাতে হবে। এবার একটি পরিষ্কার হাঁড়িতে এই পানিতে-গুলানো চালের গুঁড়াকে উনুনে প্রায় ১০ মিনিট জ্বাল দিন। জ্বাল দেওয়ার সময় অনবরত নাড়তে থাকুন। ফুটে উঠলেই অর্থাৎ বুদবুদ দেখা দিলেই হাঁড়ি নামিয়ে নিন। এখন এক চিমটি (বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী এবং মধ্যমার প্রথম ভাঁজ পর্যন্ত) লবণ মিশিয়ে দিন। এই চালের গুঁড়ার স্যালাইন রোগীকে বারবার খাওয়ান। মাঝেমাঝে বিশুদ্ধ খাবার পানিও রোগীকে খাওয়াবেন। ৬ ঘন্টার বেশি রাখলে চালের গুঁড়ার স্যালাইন নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই প্রয়োজন হলে পুনরায় স্যালাইন তৈরি করতে হবে।

বন্যার সময় পানি অবশ্যই ফুটিয়ে পান করবেন

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে; **সম্পাদক** ঃ ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক** ঃ এম. শামসুল ইসলাম খান; **কনসালটেন্ট এডিটর** ঃ ডাঃ মোড়ল নজরুল ইসলাম; **সদস্য** ঃ ইউসুফ হাসান, মুহম্মদ মুজিবর রহমান, ডাঃ মহসীন উদ্দিন আহমেদ, ডাঃ খালেকুজ্জামান, ডাঃ অমল মিত্র ও শামীম আরা জাহান; **ডিজাইন** ঃ আসেম আনসারী; **প্রকাশক** ঃ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০। ফোন ঃ ৮৭১৭৫১-৬০; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬; টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আইসিডিডি বি.জে

মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা বাংলাদেশ